Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Bani Basu's Janmabhoomi Matribhoomi and Jhumpa lahiri's Samanami (The Namesake) : A Comparative study and analysis

বাণী বসুর *'জন্মভূমি মাতৃভূমি'* ও ঝুম্পা লাহিড়ীর *'সমনামী'* (*দি নেমসেক*) : তুলনামূলক পাঠ ও বিশ্লেষণ

Parimal Chandra Das
Dept. of Bengali, K.G.T.Mahavidyalaya ,Darjeeling, West Bengal ,India

Abstract

Bani Basu is one of the major Bengali novelists,Who has been contributing one famous experiment after another to the readers of the Bengali novel since 1987. An English honours graduate and a post-graduate from the 'University of Calcutta', She has taught English literature in a college in Kolkata. As a student and teacher of English literature she is well versed about the socio-economic conditions and the philosophical outlook of the West. Bani Basu began her career as a novelist with the publication of Janmabhoomi Matribhoomi (1987). In this novel Bani Basu has presented a shrap contrast between the life of American people and non-residential middle classes of Bengal.The novel deals with the plight of a middle-class family on it's return to Kolkata after spending many years in America. On the other hand, Jhumpa Lahiri is not a Bengali writer. Born in London she emigrated to the United States after 1960s. After the grand success of the Pulitzer Prize-wining short-story collection Interpreter of Maladies she wrote her first novel The Namesake (2003) in English from America. It was later published in Bengali under the title Samanami. In Samanami, the main characters of the novel feel an anguish of alienation, loneliness and rootlessness like Bani Basu's Janmabhoomi Matribhoomi. This alienation of being a foreigner is compared to 'a sort of life long pregnancy' in Samanami . This paper attempts to explore the thematic similarities between the two novels mentioned above and delineates the intertextual traces.

Key Words : Emigrate, Language and Cultural barriers, Alienation, Rootlessness, joint family, Nostalgic

Article

অগ্রজের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার আপন চেতনায় ধারণ করেই অনুজেরা সাহিত্য ঐতিহ্যের ধারাপথটিকে প্রলম্বিত করে দেন অনাগত কালে। এভাবেই শিল্পসাধনা শাশ্বতকাল ধরে পূর্ণতার অভিমুখী। বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় মহিলা কথাকার বাণী বসু। শারদীয় *আনন্দলোক* পত্রিকায় (১৯৮৭)প্রথম উপন্যাস *জন্মভূমি মাতৃভূমি* প্রকাশের পরই বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা বুঝে নিয়েছিলেন যে, বাংলা উপন্যাসের জগতে এক শক্তিশালী লেখিকার আগমন ঘটেছে। ১৯৮৭ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাঁর রচিত একের পর এক উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। পর্যায়ক্রমিকভাবে তিনি *তারাশঙ্কর পুরস্কার* (১৯৯১), *আনন্দ পুরস্কার* (১৯৯৭) এবং *বঙ্কিম পুরস্কার* (১৯৯৯)-এ সম্মানিত হয়েছেন। ছাত্রজীবনে বাণী বসু ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়াশুনো করেছেন এবং পরে ইংরেজি সাহিত্যেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের মনোযোগী ছাত্র হবার সুবাদে ছাত্র-জীবন থেকেই তিনি পাশ্চাত্য সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে

পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তিনি সমারসেট মম, ডি.এইচ. লরেন্সের সেরা গল্পের সার্থক অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের বিদেশের সেরা গল্পরচনার সঙ্গে পরিচিত করবার এক সুমহান দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যদিকে, ঝুম্পা লাহিড়ী বর্তমানকালের একজন খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক। দীর্ঘকাল ধরে তিনি প্রবাসে রয়েছেন এবং ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর গল্প-উপন্যাস তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন করে তুলেছে। বয়সের দিক থেকে ঝুম্পা বাণী বসুর তুলনায় অনেকটাই নবীন। বাণী বসুর *জন্মভূমি মাতৃভূমি* প্রকাশের প্রায় ষোলো বছর পর ঔপন্যাসিক ঝুম্পা লাহিড়ীর আবির্ভাব। তাঁর *The Namesake* উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য এই উপন্যাসটি প্রকাশের পূর্বেই তিনি রচনা করেছেন *Interpreter of maladies* (২০০০) নামে বিখ্যাত গল্পসংকলন। এই গল্পসংকলন রচনার জন্যেই তিনি *পুলিৎজার পুরস্কার*-এ সম্মানিত হয়েছেন। *পুলিৎজার* ছাড়াও এই বইটি আরও একাধিক পুরস্কার পেয়েছে। যেমন— *পেন/হেমিংওয়ে পুরস্কার, মেটকাফ পুরস্কার* প্রভৃতি। জানা যায়, বিশ্বের প্রায় ঊনত্রিশটি ভাষায় ঝুম্পা লাহিড়ীর *Interpreter of maladies* অনুদিত হয়েছে। *The Namesake* উপন্যাসটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে *সমনামী* নামে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ছাত্রজীবন থেকেই বাণী বসু যেহেতু পাশ্চাত্য সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হয়েছেন এবং ঝুম্পা লাহিড়ীও জন্মসূত্রে বাঙালি, এবং তিনি দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছেন প্রবাসে, সেহেতু উভয়ের রচনাতেই বারবার প্রেক্ষাপট হিসেবে উঠে এসেছে একদিকে কলকাতা ও অপরদিকে আমেরিকা। দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, স্বদেশের সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি প্রবল পিছুটান বাণী বসু ও ঝুম্পা লাহিড়ী উভয়ের রচনাতেই অত্যন্ত স্পষ্ট।

জন্মভূমি মাতৃভূমি উপন্যাসের কমলিকা ও *সমনামী* উপন্যাসের অসীমা দুজনেই বিবাহের পর পাড়ি দিয়েছেন সুদূর আমেরিকায়। কমলিকা আমেরিকায় গেছেন স্বদেশে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মের পর। অসীমাকে বিয়ের কিছুদিন পরেই যেতে হয়েছে। বস্তুত নিজের দেশ, পরিচিত সমাজ-সংসার, আত্মীয় পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদেশের ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। ছিন্নমূল হবার যন্ত্রণা অসীমাকে জীবনভর সহ্য করতে হয়েছে। অসীমার নিজেরই মনে হয়েছে বিদেশে থাকা মানেই *a sort of life long pregnancy* নিয়ে থাকা। অসীমা আপাদমস্তক বাঙালি কন্যা; বিয়ের পর স্বামীর পদবি গ্রহণ করলেও বাঙালি নারীর স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ তিনি কখনও স্বামীর নাম উচ্চারণ করেন না। আমেরিকান মেয়ে বউদের মতো হাঁটু পর্যন্ত ঝুল গাউন পরা অসীমার কাছে বেশ অস্বস্তিকর। তিনি বরং মুর্শিদাবাদি সিল্কের শাড়িতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আমেরিকানদের মতো চামড়া না ছাড়িয়ে মুরগির মাংস তিনি খেতে চান না। বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকতে চান এই দূর প্রবাসে গিয়েও। পুরনো হয়ে যাওয়া একটি *দেশ* পত্রিকার খসখসে পাতাগুলি তাঁর মনে এক চিরস্থায়ী সান্ত্বনা এনে দেয়। একটু সরষের তেলের জন্য তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। হাসপাতালের ডাক্তার অসীমার প্রথম সন্তানের স্বাভাবিক জন্মের কথা বলে আশ্বস্ত করতে চাইলেও, অসীমার কোনো কিছুই স্বাভাবিক লাগে না। আসলে গর্ভিণী হবার যন্ত্রণা তেমন কিছু নয় অসীমার কাছে। তাঁর আসল সমস্যাটা হ'ল যন্ত্রণার ফল নিয়ে—

> *সকালের শরীর খারাপ, রাতে ঘুম না আসা, পিঠের চাপা ব্যথা, বারবার বাথরুমে যাওয়া এসব তবু সহ্য করা যায়। সমস্ত সময়টা, শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও, সে তার নিজের শরীরের প্রাণ সৃষ্টি করার ক্ষমতায় বিস্মিত হয়েছে, ঠিক যেমন তার মা বা দিদিমা বা পূর্বনারীরা হয়েছিলেন। স্বদেশ থেকে এত দূরে, ভালবাসার মানুষদের থেকে আলাদা হয়ে যে এটা ঘটতে পারছে, সেটাই বা কম অদ্ভুত নাকি? কিন্তু আত্মীয়স্বজনবিহীন, অল্পচেনা এক দেশে বাচ্চা বড় করার ভয়টাই তাকে পেয়ে বসেছে। এখানে জীবন কেমন যেন অনিশ্চিত, পরিমিত।*[১]

অসীমার বারবার মনে পড়ে যায় স্বদেশে তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের কথা— '' যাদের এখন নতুন বাচ্চাকে ঘিরে থাকার কথা, তারা নেই . . . দাদু-দিদা, মাসি-পিসি, কাকা-মামাদের উপস্থিতি ছাড়া এই শিশুর জন্ম আমেরিকার অন্য সবকিছুর মতোই অগোছালো, যেন পূর্ণ নয়, আংশিক সত্য মাত্র।''[২] পুত্রসন্তান জন্মের পর অসীমা অধৈর্য হয়ে পড়েন। স্বামী অশোককে একদিন হঠাৎ করে বলে দেন— '' তাড়াতাড়ি ডিগ্রিটা শেষ করো . . . এই দেশে আমি গোগোলকে একা মানুষ করতে পারব না। সেটা ঠিক হবে না। আমি ফিরে যেতে চাই।" [৩] কিন্তু, ফিরতে চাইলেই তো আর ফেরা যায় না। প্রবাসে যাওয়াটা তাঁর কাছে যতটা সহজ ছিল, ফিরে আসার পথ ততটাই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রবাস জীবনকে

একপ্রকার মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়া ছাড়া অসীমার আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু, বাণী বসুর *জন্মভূমি মাতৃভূমি* উপন্যাসে প্রবাসজীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে বিশেষ অসুবিধে হয় নি কমলিকার। মানিয়ে নিতে পারার কারণ হিসেবে কমলিকার স্বামী সুদীপ জানিয়েছেন —

> *আমি জানি, আসলে দেশে কমলিকা অসুখী ছিল। যা রোজগার করতুম তাতে যৌথ পরিবারের পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে হাতে বিশেষ কিছু থাকত না। কমলিকা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, উপরন্তু ছোট পরিবারের মেয়ে। খুবই সুখ স্বাধীনতার মধ্যে মানুষ। ওর তাতে অসুবিধে হত . . . ছায়াভরা দিঘির মতো গভীর চোখগুলো ওর সবসময়ে বিষণ্ণ হয়ে থাকত। আমাদের প্রথম সন্তান বাবুকে প্রতিদিন ডিম-কলা-পরিজের ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে না পারলে ও চোখের জল ফেলত।*[৪]

তাছাড়া, কমলিকার সঙ্গে অসীমার আরেকটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। কমলিকা প্রবাসে গিয়েও নিজের জন্য ভালো একটা চাকুরি জুটিয়ে নিয়েছিল। কাজেই কমলিকার জীবনে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ছিল না। অসীমা স্বামী,পুত্র,কন্যার সুখের কথা ভেবে চাকুরি করেন নি। বাঙালি গৃহবধূর মতো জীবন কাটাতে গিয়ে তাঁকে একাকিত্বের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। যদিও শেষ পর্যন্ত একান্ত বাধ্য হয়েই অসীমা একটা লাইব্রেরিতে পার্টটাইম কাজ নিয়েছিলেন; কিন্তু, সেই কাজ তাঁকে নিঃসঙ্গতা থেকে সাময়িক মুক্তি দিলেও, তা চিরস্থায়ী সমাধানের পথ দেখাতে পারে নি। এমন নয় যে, প্রবাসে গিয়ে কমলিকা একেবারে নিজেকে বদলে নিয়েছেন, বা ভারতীয় তথা বাঙালির জীবনাদর্শ থেকে নিজেকে একেবারে ছিন্ন করে নিয়েছেন। কমলিকা গান করেন, শোনেন নারায়ণ রাও ব্যাসের বৃন্দাবনী সারং। হিউসটনে নিজের বাড়িতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটা ছোট্ট ক্লাসও নিয়ে থাকেন। ছাত্রদের শেখান মীরার ভজন। *ইণ্ডিয়ান কালচারাল সোসাইটির* সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। নিজের মতো করে বাঁচতে শিখেছিলেন বলেই সুদূর প্রবাসে গিয়েও কমলিকার নিজেকে মানিয়ে নিতে কোনো অসুবিধে হয় নি। শুধু আর্থিক কারণেই নয়, নিজের মতো করে বাঁচার প্রয়োজনে একালের নারীদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে— তা দেশেই হোক বা বিদেশে। *সমনামী* -র অসীমার জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় ভুল। আমেরিকার মতো দেশে বাঙালি গৃহবধূর মতো জীবন কাটাতে চাইলে পরিণামে যে তা মর্মান্তিক হয়ে উঠতে পারে- অসীমা তা বুঝতে পারেন নি। ঔপন্যাসিক বাণী বসু তাঁর *জন্মভূমি মাতৃভূমি* উপন্যাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পেরেছেন যে, যত পিছুটান, সামাজিক-পারিবারিক-মানসিক টানাপোড়েন— এ সবই আসলে বাঙালি মধ্যবিত্তের মজ্জাগত। আমেরিকায় সুদীপ-কমলিকার পারিবারিক বন্ধু জ্যোতি, দীপঙ্করেরা আর্থিক দিক থেকে অনেকটাই উচ্চবিত্ত শ্রেণির। তাঁদের জীবনে সাংসারিক-পারিবারিক টানাপোড়েন নেই বললেই চলে। দীপঙ্কর আমেরিকান তরুণী অ্যান-কে বিয়ে করে পুরোপুরি অ্যারিকানাইজড্ হয়ে গেছেন। জ্যোতিও আমেরিকান সিটিজেনসিপ নিয়ে নিতে কোনো দ্বিধা করেন নি। জ্যোতির স্ত্রী দীপালি ওল্ড দিল্লির মেয়ে। শ্বশুরবাড়ি বা বাপেরবাড়ি কারও কোনও দায় স্বীকার করবার মেয়েই নয় —

> *আসলে দীপালিরা ঠিক মধ্যবিত্ত সমাজের নয়। ওর বাবা ছিলেন মিলিটারিতে, এয়ারফোর্সে খুব বড় পোস্টে কাজ করতেন। অন্যরকম মানসিকতায় গড়া ওরা। বাইরে ঘরোয়া দেখালেও ভেতরে ভেতরে আমাদের থেকে আলাদা। ওদের বাড়িতে সন্ধেবেলা নিয়মিত সুরার আসর বসত। ওর বাবা দাদা সব একসঙ্গে। দীপালির মা-ও যোগ দিতেন বোধ হয় মাঝে মাঝে।*[৫]

জ্যোতি-দীপালিরা খুব অনায়াসে, হাসতে হাসতে সব দায় ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। বিয়ের বছরখানেক পর থেকেই ওঁরা নিউ ইয়র্কে। দু-তিন বছর অন্তর অন্তর নিয়ম করে দেশে যান। দেশের লোকেরাও দীপালিদের কাছ থেকে কোনো কিছু প্রত্যাশার ধার ধারে না। এঁদের সঙ্গে কমলিকা বা অসীমাকে ঠিক মেলানো যায় না।

জন্মভূমি মাতৃভূমি উপন্যাসের প্রবাসী সুদীপ-কমলিকার পরিবারের সঙ্গে *সমনামী* উপন্যাসের অশোক-অসীমার পরিবারের বিশেষ মিল রয়েছে। সুদীপ-কমলিকার মতোই অশোক-অসীমারও দুই সন্তান—এক পুত্র ও এক কন্যা। তবে, সুদীপ-কমলিকার পুত্র বাবু-র জন্ম ভারতে আর কন্যা আরাত্রিকার জন্ম আমেরিকায়। অন্যদিকে, অশোক-অসীমার পুত্র গোগোল ও কন্যা সোনিয়া—দু'জনেরই জন্ম আমেরিকায়। বস্তুত, প্রবাসে সন্তানের জন্ম হলে এবং সেখানেই যদি সন্তানকে বড় করে তুলতে হয়, তবে সন্তানের নামকরণ নিয়ে জনক-জননীকে যথেষ্ট বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। যতই বলা হোক না কেন *What's in a name?* — নামে অনেক কিছুই এসে যায়। আমাদের দেশে কানা ছেলের নাম *পদ্মলোচন* রাখা যেতেই পারে। কিন্তু, দেশের প্রধানমন্ত্রি বা রাষ্ট্রপতির নাম *ভাঁড়ু দত্ত* ভাবা

যায় কি? পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেও এ কথা বলার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অন্যায় নেই যে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রির নাম *গদাধর* বা *দুখীয়া* কখনই মানানসই হতে পারে না। বাণী বসুর *জন্মভূমি মাতৃভূমি* উপন্যাসে সুদীপ-কমলিকার প্রথম সন্তান বাবুর জন্ম কলকাতায়। কাজেই *স্বদেশ* নামকরণ নিয়ে তার বাবা-মাকে দু'বার ভাবতে হয় নি। কিন্তু, কন্যা আরাত্রিকার জন্ম আমেরিকায়। *আরাত্রিকা* কথাটির অর্থ আরতির প্রদীপ; এই প্রদীপ হাতে করে নিয়ে দেবতাকে পথ দেখানো হয়। বাবা-মা আরাত্রিকা কথাটিকে একটা স্পিরিট হিসেবেই কন্যাকে গ্রহণ করতে বলেছেন। শব্দটিতে এক ধরণের ক্ল্যাসিক্যাল ধ্বনি-গাম্ভীর্যও রয়েছে। কিন্তু, সমস্যা হল— যে দেশে রবীন্দ্রনাথকে কেউ তেমন একটা চেনে না, *ইন্ডিরা গ্যান্ডি, মহাট্মা গ্যান্ডি* পর্যন্ত যাঁদের দৌড়— সেখানে *আরাত্রিকা* নাম নিয়ে তো সমস্যা হবারই কথা। আরাত্রিকার সমবয়সী বন্ধুরা বহুকষ্টে *অ্যারাট্রিকা* পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারে। তাই তারা আরাত্রিকাকে *ট্রিকসি* বলে ডাকতে শুরু করে দেয়। ঝুম্পা লাহিড়ীর *সমনামী* উপন্যাসেও সন্তানের নামকরণ প্রসঙ্গ যে একটা বড় জায়গা পেয়ে যাবে, তা উপন্যাসের নামকরণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে 'নাম' শুধু ব্যক্তি-মানুষের নিছক পরিচয় বা identity নয়, তার সত্তারও পরিচায়ক। *সমনামী* তে অশোক তাঁর পুত্রের ডাকনাম দিয়েছেন 'গোগোল',আর স্কুলে ভর্তি করবার সময়ে ভাল নাম 'নিখিল'। বস্তুত, এই 'নিখিল' নামের মধ্যেও নিকোলাই গোগোলেরই নামের ছায়া রয়েছে। এই নামকরণ একদিকে বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক নিকোলাই গোগোলের প্রতি মুগ্ধতার প্রকাশ, অন্যদিকে কোনও এক রেল দুর্ঘটনায় যখন প্রাণ হারাতে বসেছিলেন অশোক, তখন গোগোলের গল্পসংগ্রহের একটি উড়ন্ত পৃষ্ঠাই তাঁকে রক্ষা করে। সন্তানের নাম তাই ফিরে পাওয়া জীবনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় অশোকের কাছে। ছোটবেলায় এই নামেই সাড়া দিয়েছে গোগোল। ঘটনাচক্রে ডাকনামটিই গোগোলের ভালনাম হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু, বড় হবার পর সে কিছুতেই এই নাম মেনে নিতে পারে না। বিখ্যাত লেখক নিকোলাই গোগোলকে সে একটুও ভালবাসেনা। গোগোলের লেখা বইও তার পছন্দ নয়। বাবা বারবার উৎসাহ দিলেও গোগোলের বা অন্য কোনও রাশিয়ান লেখকের লেখা একটি শব্দও সে পড়তে চায়নি। গোগোলের ভাবতেও ঘেন্না করে যে, তার নামটা হাস্যকর আর বৈশিষ্ট্যহীন। সাবালক গোগোল বুঝতে শিখেছে যে, তার একটা নিজস্ব সত্তা আছে। কিন্তু ওই নামটির সঙ্গে তার নিজস্ব সত্তার কোনও সম্পর্ক নেই। নামটি ভারতীয় বা আমেরিকান কোনোটাই নয়, রাশিয়ান। এই ভালনাম হয়ে ওঠা ডাকনামটা নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটাতে তার একটুও ভাল লাগে না। প্রেমেও এই নাম বাধা হয়ে দাঁড়ায় গোগোলের কাছে। ওর বয়সের অন্য ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং করতে আরম্ভ করেছে। তারা বান্ধবীদের নিয়ে পিৎজা খেতে বা সিনেমা দেখতে যায়। কিন্তু গোগোল ভাবতেই পারে না কোনও রোমান্টিক পরিস্থিতিতে সে নিজেকে গোগোল বলে পরিচয় দিচ্ছে। অতঃপর সে আমেরিকান আদালতে গিয়ে এফিডেভিট করে নাম পরিবর্তন করে 'গোগোল' থেকে 'নিখিল' হয়ে যায়। গোগোল স্কুলে ভর্তি হবার পর অসীমার কোলে দ্বিতীয় সন্তান আসে। কন্যা সন্তান। এবার আর অশোক ও অসীমা সন্তানের নামকরণ নিয়ে কোনো ভুল করেননি। তার নামকরণ করা হয় সোনালী। বাড়িতে তাকে সোনু বলে ডাকে। অশোক অসীমা জানেন— এই সোনালীই এক সময় 'সোনিয়া' হয়ে যাবে। তাতে কোনো আক্ষেপ নেই। সোনিয়া নামটি তাকে বিশ্ব-নাগরিক হতে সাহায্য করবে। কেননা ইউরোপ বা দক্ষিণ আমেরিকায় সোনিয়া নাম বিশেষ জনপ্রিয়। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ইতালিয়ান স্ত্রীর নামও সোনিয়া।

জন্মভূমি মাতৃভূমি ও *সমনামী* উভয় উপন্যাসেই প্রবাসে থেকে সন্তানদের মানুষ করা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ লক্ষ করা গেছে। স্বদেশ ওরফে বাবু বড় হচ্ছে—সুদীপ-কমলিকার দুশ্চিন্তার যেন বিরাম নেই। দুশ্চিন্তার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। সুদীপ-কমলিকা লক্ষ করেছেন বাবুর মানসিক গড়নটিই সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমেরিকায় বাস করলেও আমেরিকা ও আমেরিকানদের প্রতি তার আগ্রহ নেই—

> *বেছে বেছে ব্ল্যাক আমেরিকানদের সঙ্গে ভাব করে। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'হোয়াইটস? একটা দেশের আসল বাসিন্দাদের মেরে ধরে তাদের বিলিয়নস অ্যান্ড বিলিয়নস অফ একর জমি দখল করে নিয়েছে, আরেকটা দেশ থেকে মানুষকে জানোয়ারের মতো ধরে এনে জানোয়ারের মতোই খাটিয়েছে, বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে আরেকটা দেশের ওপর আবার অ্যাটম বোমার এক্সপেরিমেন্ট করেছে, ওদের সম্পর্কে আমার ইন্টারেস্ট কম মা!*[৬]

ছেলের নাম 'স্বদেশ'। জন্ম ভারতে বলে সে আত্মিকভাবে কখনই আমেরিকান হয়ে ওঠেনি। বাবুর ভাবনার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে ভারতে, কলকাতার বউবাজারের বাড়ির উঠোনে। আমেরিকায় বড় হয়ে উঠলেও সব সময় ভারতবর্ষ নিয়েই তার প্রবল দুশ্চিন্তা—

> *আমার দেশ? আমার দেশের অসুখ যে কত গভীরে কীভাবে আমি কুপার নামের এই বালকটিকে বোঝাই? ও শুধু ওর মায়ের স্কার্টে একটা ফুটো দেখেই এমন করছে যেন সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। শতচ্ছিন্ন আঁচলে লজ্জায় মুখ-ঢাকা আমার মাতৃভূমির কথা ও কী বুঝবে? বাবা-মা সবসময়ে যেতে না পারলেও আমি কিন্তু বারে বারে একা একা ফিরে গেছি দেশে। দুর্নীতির কী পচা ঘা থিকথিক করছে ওপর তলায় নীচ তলায়! দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি! দাদু বলছিল, মাসের শেষে স্যালারি চেক নিতে গেলে ঘুষ দিতে হবে এমন দিন আসলেও অবাক হব না। রাজনীতি আর শো-বিজে এখন কোনও তফাৎ নেই। নিজস্ব সংস্কৃতির নামে যে যার কায়েমি স্বার্থ আঁকড়ে আছে, দরকার হলে সংসার আলাদা করবে তবু সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়বে না। ভিন্ন দেশের গুপ্তচরবৃত্তি করবে তবু দেশের সংবিধান-সিদ্ধ কাজে হাত মেলাবে না। আর ল্যাবরেটরির নোংরা রাজনীতির সঙ্গে আপস করতে না পেরে পালিয়ে আসছে বিজ্ঞানীরা, প্রযুক্তিবিদরা। আমেরিকা তাদের চাঁদি দেখিয়ে ডাকছে। গ্রেনাডা-ক্যারিবিয়ান সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তী যা বলেছেন, প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে সেই কথাগুলোই কেন জানি না আমার মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করে।* [৭]

স্বদেশের জন্ম ভারতে, কিন্তু বাবা-মায়ের সঙ্গে তাকে থাকতে হয় আমেরিকায়। প্রতি পদে পদে 'আইডেনটিটি'র সংকট তাকে বিদ্ধ করে। স্বদেশ অনুভব করতে পারে—

> *স্বদেশের চিহ্ন এই ক্ষুদ্র সমাজে মেয়েদের শাড়ির বাক্সয়, কিছু পুরুষের রাত্রিবাসে, চোখমুখের আদলে বেঁচে আছে। আর একটা প্রজন্ম পরেই ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে সেই জনের আত্মপরিচিতিহীন নিয়তির অন্ধকারে কিছু না জেনেই প্রবেশ করবে সে। ওই ক্ষীণ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে বাটিকের দুর্গাঠাকুর পুজো করে, সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বাংলা সাইক্লোস্টাইল পত্রিকায় বাঙালি আড্ডার ইতিহাস পর্যালোচনা করে, বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে। নিজমূল থেকে উৎপাটিত এই সংস্কৃতি পরের প্রজন্ম কখনও গ্রহণ করবে না। এসব বিদ্যা শিখতে হয় চিনেদের কাছ থেকে। যেখানেই যায় বানিয়ে নেয় চায়না টাউন। আমাদের একদেহে লীন হয়ে যাবার সহজ মন্ত্রটা জানা আছে। আত্মস্বাতন্ত্র্যের মশাল জ্বালিয়ে রাখবার কৌশলটা আমরা জানি না। লীন হয়ে গেলেই যে চমৎকার একটা বিশ্বজনীন সভ্যতার সব পেয়েছি জিমনাসিয়ামে ঢুকে পড়ে ইচ্ছেমতো খেলাধুলো করা যাবে তা কিন্তু নয়। প্রতিপদে আইডেনটিটির সংকট আমাদের বিদ্ধ করবে, বধ করবে।* [৮]

স্বদেশের এই উপলব্ধির মধ্যে কোনও ফাঁকি নেই। ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের কেরিয়ার না গুছিয়ে সে যে দেশসেবা বা সমাজসংস্কারে আত্মনিয়োগ করতে চলেছে একথা বলাই বাহুল্য। স্বদেশের ব্ল্যাক আমেরিকান প্রীতিও সুদীপ-কমলিকাকে ভাবিয়ে তোলে—

> *গ্রীষ্মকালের এক রবিবারের সকালে অবাক হয়ে গার্ডেনিয়ার ফুল দেখছেন সুদীপ আর তিনি। দেশের গন্ধরাজ কী অপূর্ব স্বাস্থ্যমণ্ডিত মহিমায় ফুটেছে টেক্সাসের মাটিতে! বাবু গুঁড়ি-গুঁড়ি চুল, চ্যাপটা নাক, অনবদ্য ফিগারের একটি কালো মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ঢুকল, 'মা, মিট মাই ফ্রেন্ড ক্যাথি।' গন্ধরাজের সৌরভে বুঁদ হয়েছিলেন দুজনে, বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠেছিল। এই পশমি চুল কৃষ্ণকন্যাকেই যদি স্টেডি ডেট-টেট করে বসে ছেলে!* [৯]

বিদেশের ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে স্বদেশ যে ক্রমশ বাবা-মায়ের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, তা বুঝতে পেরে সুদীপ-কমলিকা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সুদীপ-কমলিকার আতঙ্কের আরও একটা বড় কারণ রয়েছে। স্বদেশ নিজেও বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত—

> *কিছুদিন ধরেই চতুর্দিকে একটা নতুন রোগের নাম শুনতে পাচ্ছি। গে রিলেটেড ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি। এটা নিয়ে আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে কিছু কিছু ডাক্তার লেকচার দিয়ে গেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, টেক্সাস সর্বত্র নাকি মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে এ রোগ। সমকামীদের হয় বলে শুনেছিলুম প্রথমে। তারপরে শোনা গেল যৌন সংক্রমণে তো হয়ই। তা ছাড়াও ব্লাড ট্রানসফিউশন, ইনট্রাভেনাস ইনজেকশন এসব থেকেও হতে পারে।* [১০]

প্রকৃতপক্ষে, জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে ঢের বেশি বিজ্ঞান আর সম্পদ আজ অনেকেরই হাতের কাছে। সোজা পথে উপভোগটাও বড্ড সহজপ্রাপ্য হয়ে গেছে তাদের কাছে। তাই এক শ্রেণির মানুষ বক্রগতিতে উপভোগের পথ খুঁজে নিচ্ছে। মানুষ দেহের জ্বালায়, মনের জ্বালায় উদ্দেশ্যহীন নেমে যাচ্ছে পথের ধারে। সম্পদের শেষ চেহারাটা দেখা হয়ে গেলে বোধ হয় আর কিছু থাকে না শুধু অধঃপতন ছাড়া। এক সর্বগ্রাসী ভোগবাদে আচ্ছন্ন

সমাজ, প্রগতির নামে দৈহিক বিলাসের অঢেল বন্দোবস্ত রয়েছে যেখানে, সেই আমেরিকার একটি শহরে বসবাস করে মধ্যবিত্ত বাঙালি দম্পতির তাদের সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তবে, স্বদেশ ব্ল্যাক আমেরিকান যুবক কুপারের মতো অশান্ত নয়, লুসিয়ানাদের মতো অবুঝ বা উদ্‌ভ্রান্তও নয়। তার সত্তার মূল শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে রয়েছে জন্মভূমি ভারতের মাটিতে। প্রগতির নামে শুধু দৈহিক বিলাস ও সম্পদ বৃদ্ধির নেশায় সে মেতে ওঠেনি কখনও। তবুও স্বদেশ তার বাবা-মায়ের নাগালের বাইরে। স্বদেশ ক্রমশ বাবা-মায়ের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় সুদীপ-কমলিকার যাবতীয় শাসন গিয়ে পড়ে কন্যা আরাত্রিকার ওপর। কন্যা আরাত্রিকার ব্যক্তিস্বাধীনতায় বারবার হস্তক্ষেপ করেন তার বাবা-মা। আরাত্রিকা তেরো বছর বয়স পূর্ণ করলে, তার শরীরে যৌবনের বান ডেকে এলে, পিতা সুদীপ ঘোর দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েন —

> *জীবন এবার সমুদ্রগামী নদীর মতো কলকল্লোলে ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত সত্তায়। দেহের রসায়নে বিপ্লব। ভেতর থেকে ঘুম ভেঙে উঠে বসবে একটা আনকোরা নতুন মানুষ। তার হাসি-কান্নায় নতুন মাত্রা। অনুভবে নতুন স্বাদ, খেলা কি আর শুধু খেলাই থাকবে? সযত্নে গড়ে তোলা ছেলেমানুষি পৃথিবীর গণ্ডি ফেটে বেরিয়ে যেতে থাকবে হিসেবের বাইরের অতিরিক্ত জীবন। সে অপচয়ে কী আনন্দ! কী রোমাঞ্চ! এই প্রাচুর্য ওকে কি শুধু উচ্ছ্বাসই দেবে? না প্রগাঢ়তা! কীভাবে এই যৌবনকে ও গ্রহণ করবে, ব্যবহার করবে তারই ওপর তো নির্ভর করছে সব কিছু।*[১১]

প্রকৃতপক্ষে, আমেরিকান তরুণ-তরুণীদের জীবন একেবারেই অন্য রকম। আমাদের বাঙালি বা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একেবারেই মেলানো যায় না। যৌবনে পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গেই তারা বাবা-মায়ের আঁচল ধরা ছেড়ে দেয়। বন্ধুদের সঙ্গে এক্সকার্সনে যায়। সফট্ ড্রিঙ্কস্ ছেড়ে হার্ড ড্রিঙ্কসে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আরাত্রিকার মুখে একদিন এক্সকার্সন আর হার্ড ড্রিঙ্কসের কথা শুনে বাবা-মা দুজনেই বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এক্সকার্সনে যাবার কথা বললে সুদীপ আরাত্রিকাকে বলেন— '' আমি কি তোমায় ডিজনিল্যান্ড দেখাইনি আরাত্রিকা! ''[১২] অর্থাৎ সহপাঠীদের সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাবার স্বাধীনতা কন্যা আরাত্রিকাকে দিতে চান না তার বাবা। হার্ড ড্রিঙ্কস্ না নেবার জন্যেও তিনি আরাত্রিকাকে সতর্ক করে দিয়েছেন— '' তোরা এখন সবে জীবন আরম্ভ করেছিস মণি, যা কিছু দেখছিস সবই তো তোদের কাছে নতুন, একসাইটিং। এখনই যদি তোরা হার্ড ড্রিঙ্কস্-এর কৃত্রিম উত্তেজনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়িস তো পরে কী করবি? বন্ধুদের বোঝাতে পারিস না?" [১৩] আমেরিকান ছেলে-মেয়েদের মতো স্বাধীনতা কখনই পায় নি আরাত্রিকা। সেখানে তাকে বাঙালি মেয়েদের মতোই বড় হয়ে উঠতে হয়েছে। আক্ষেপ থাকলেও, সে তার বাবা-মা-দাদার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েই বড় হয়ে উঠেছে। আরাত্রিকা বাবাকে কথা দিয়েছে যে, সে কোনওদিনই হার্ড ড্রিঙ্কস-এর উন্মাদনায় মেতে উঠবে না।

অন্যদিকে *সমনামী* উপন্যাসে অশোক-অসীমার পুত্র গোগোল ও কন্যা সোনিয়া স্বদেশ ও আরাত্রিকার তুলনায় পৃথক। বাবা-মায়ের প্রতি গোগোল ও সোনিয়ার আনুগত্য,শ্রদ্ধা,ভালবাসা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না থাকলেও, একেবারে প্রশ্নহীনভাবে বাবা-মায়ের পৃথিবীতে ঢুকে পড়তে তারা নারাজ। একটু বড় হবার পর পড়াশুনোর প্রয়োজনে তারা উভয়েই বাবা-মায়ের থেকে আলাদা থাকতে শুরু করে। জন্ম আমেরিকায় বলে এবং বাঙালি বা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের নিবিড় পরিচয়ের অভাবের কারণে তারা ছোটবেলা থেকেই আত্মিকভাবে আমেরিকান হয়ে উঠতে থাকে। ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়েদের থেকে দূরে থাকে বলে অসীমা প্রবল মনঃকষ্টে ভুগতে থাকেন। শুধু দূরে থাকাই নয়, তাঁর ছেলেমেয়েরা সপ্তাহান্তে ছুটি পেলেও সবসময় বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতেও আসতে চায় না। প্রত্যেক বাবা-মা-ই চান সন্তান সান্নিধ্য নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে। কিন্তু হতাশ হতে হয় অশোক ও অসীমাকে। অশোক যদিও বা কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকেন, সন্তানের দূরত্বজাত যন্ত্রণা তাঁকে খুব একটা বিদ্ধ করতে পারে না; কিন্তু অসীমা একাকী ও নিঃসঙ্গে বলে তাঁর মনোকষ্ট অত্যন্ত প্রবল—

> *আমেরিকায় আসার পর থেকে নিজের বাবা-মায়ের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাওয়াটা অসীমাকে এতই কষ্ট দিয়েছে যে, সে কিছুতেই বুঝতে পারে না তার ছেলে বা মেয়ের এত স্বাধীনতা প্রয়োজন কেন। কেন তাদের দরকার হয় মায়ের থেকে দূরে থাকার। তবু সে এ নিয়ে কোনও তর্ক করে না . . . এ নিয়ে লাইব্রেরির বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তারাও বলে, এমনটা হবেই। ছেলে-মেয়েরা সবসময় ছুটিতে বাড়ি ফিরবে, এমন আশা করা উচিত নয়।*[১৪]

কিন্তু, দিনে দিনে পুরোদস্তুর আমেরিকান হয়ে ওঠে গোগোল। কলেজে ভর্তি হবার পর থেকেই সে ক্রমশ বাবা-মায়ের ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। অশোক ও অসীমা ওঁদের সব বাঙালি বন্ধুদের মতো ওঁরাও চান ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হোক, বা ডাক্তার, বা আইনজীবী, কিংবা নিদেনপক্ষে একজন অর্থনীতিবিদ। কিন্তু গোগোল পড়াশুনোয় কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে মেজর করে না নেওয়ায় তাঁরা গোগোলকে নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বাবা গোগোলকে বারবার বোঝাতে চেয়েও ব্যর্থ হন যে, কোনো একটি বিশেষ পেশাই তাকে নিশ্চিত জীবন ও সামাজিক শ্রদ্ধা এনে দিতে পারে। কলকাতার ছেলে অশোক এই নিশ্চিত জীবন ও সামাজিক শ্রদ্ধার সন্ধানেই দূর প্রবাস আমেরিকায় বসবাস করছেন। কিন্তু গোগোল এখন আর 'গোগোল' নয়, সে 'নিখিল'। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থা খুঁজে পেয়েছে সে। সুতরাং বাবা-মার ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনার প্রভাব থেকে বেরিয়ে যেতেই পারে—

> *নিখিলের খোলসে থাকতে থাকতেই প্রথম সেমেস্টারে সে থুতনিতে ছোট্ট দাড়ি রাখে। পার্টিতে গিয়ে ক্যামেল লাইট্স সিগারেট খেতে শেখে। আর পরীক্ষার ঠিক আগে ব্রায়ান ইনো, এলভিস কস্টেলো আর চার্লি পার্কারকে খুঁজে পায়। নিখিলের ভূমিকাতেই সে জোনাথনের সঙ্গে মেট্রো করে ম্যানহাটনে যায়, জাল পরিচয়পত্র জোগাড় করে যাতে নিউ হ্যাভেনের মদের দোকানে মদ পেতে পারে। নিখিল হিসেবেই এজরা স্টাইলসের একটা পার্টিতে সে কুমারত্ব হারায়। মেয়েটা উলের স্কার্ট পরেছিল, উঁচু বুটজুতো আর কালচে-হলুদ রঙের টাইট্স। ভোর তিনটে নাগাদ প্রবল হ্যাংওভার নিয়ে জেগে উঠে সে দেখল, ঘরে কেউ নেই। মেয়েটার নাম মনে নেই নিখিলের।*[১৫]

গোগোলকে নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা সত্য হয়ে দেখা দিল অচিরেই। গোগোল পড়াশুনোর পাশাপাশি একটা আর্কিটেকচার ফার্মে কাজ জুটিয়ে নিলেও বাবা-মায়ের প্রত্যাশা এতে পূরণ হয় নি। কাজ পাবার পরেও বাবা তাকে প্রায় নিয়মিত চেক সই করে দিতেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার গোগোল একাধিক প্রাক্-বিবাহ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে থাকে। সে রুথ নাম্নী একটি মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছে। এসব ব্যাপার যে বাবা-মায়ের কাছে একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমন নয়। এই প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় তাঁরা খুশি নন, গর্বিতও নন। রুথের অবশ্য তাতে বিশেষ হেলদোল নেই। গোগোলের বাবা-মায়ের এই অখুশি হওয়াটাকে তার কাছে বেশ রোমান্টিক বলেই মনে হয়। গোগোল ভাবে রুথের সঙ্গে তার এই সম্পর্ক বাবা-মায়ের সহজভাবেই মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু রুথের সঙ্গে গোগোলের সম্পর্ক মজবুত হবার পূর্বেই ভেঙে গেল। রুথ ইংল্যান্ডের একটি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়তে যেতে চায়। সে চায় গোগোলও তার সঙ্গী হয়ে ইংল্যান্ডের কোনো আর্কিটেকচার স্কুলে যোগদান করুক। কিন্তু গোগোল রুথের সহযাত্রী হতে পারেনি। কাজেই তাদের সম্পর্কের মধ্যেও চিরকালের জন্য বিচ্ছেদরেখা টানা হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি বা ভারতীয় যুবক-যুবতীদের সঙ্গে আমেরিকান যুবক-যুবতীদের জীবনশৈলির এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রেমের জন্য ত্যাগ স্বীকার নয়— প্রবল আত্মবিশ্বাসী আমেরিকান ছেলেমেয়েরা নিজেদের উজ্জ্বল কেরিয়ারের জন্য প্রয়োজনে প্রেমকে ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। গোগোল নিউ ইয়র্কে থেকে পড়াশুনো করে। কলম্বিয়া থেকে আর্কিটেকচারে সে স্নাতক হয়েছে। নিউ ইয়র্কে থাকাকালীন গোগোল তারই প্রায় সমবয়সী এক যুবতী ম্যাক্সিনের প্রেমে পড়ে। ম্যাক্সিন কলম্বিয়া-বার্নার্ড থেকে আর্ট হিস্ট্রিতে মেজর করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে ম্যাক্সিন ভীষণ খোলামেলা। সে তার নিজের অতীত ঢেকে রাখার কোনো চেষ্টা করে না। ম্যাক্সিন গোগোলকে মার্বেল কাগজের অ্যালবাম খুলে পুরনো প্রেমিকদের ছবি দেখায়। নিজের জীবন নিয়ে তার কোনো দুঃখ নেই, কোনো হতাশা বা অপ্রাপ্তির বোধও নেই। বাবা-মায়ের সঙ্গে ম্যাক্সিনের সম্পর্কে কোনো দূরত্ব নেই। যে কোনো ঘটনার কথা সে অনায়াসে বাবা-মাকে খুলে বলতে পারে। গোগোলের মনে হয়— ''তাদের দু'জনের মধ্যে এই পার্থক্যটিই সবচেয়ে গভীর। ম্যাক্সিনের এই বিরাট বাড়িটায় বড় হয়ে ওঠা বা দামি পাবলিক স্কুল এডুকেশনের চাইতে এই মানসিক স্থৈর্যই তাকে গোগোলের চেয়ে আলাদা করে রাখে।" [১৬] ম্যাক্সিন গোগোলের জীবন সম্পর্কে কিছু কথা শুনে অবাক হয়ে যায় — ''বাবা-মায়ের সব বন্ধুই যে বাঙালি, তাঁদের সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছিল, মা রোজ ভারতীয় পদ রান্না করেন, তিনি শাড়ি আর টিপ পরেন।" [১৭] গোগোলও ম্যাক্সিনের বাবা-মা জেরাল্ড ও লিডিয়াকে দেখে বেশ অবাক হয়ে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে তারা কত স্বাভাবিক —

লিডিয়ার জন্মদিনে জেরাল্ডের দেওয়া দামি গয়না, কোনও কারণ ছাড়াই বাড়িতে ফুল নিয়ে আসা, পরস্পরকে খোলাখুলি চুমু খাওয়া, শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে যাওয়া বা বাইরে ডিনার করতে যাওয়া . . . সন্ধেয় সোফার উপরে জেরাল্ড ও লিডিয়াকে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা থাকতে দেখে গোগোল ভাবে, তার নিজের বাবা-মার মধ্যে সে সারাজীবনে একবারও শারীরিক ঘনিষ্ঠতা দেখেনি। ওদের মধ্যে যদি প্রেম থেকেও থাকে, তা একেবারেই ব্যক্তিগত, কোনওভাবে প্রকাশ করার যোগ্য নয়। [১৮]

গোগোল প্রায় নিয়মিত ম্যাক্সিনের সঙ্গে রাত কাটায়, ম্যাক্সিনের বাবা-মায়ের সামনেই, এক ছাতের নীচে।

প্রকৃতপক্ষে গোগোল ও সোনিয়া বাঙালি বাবা-মায়ের সন্তান হলেও জন্ম তাদের আমেরিকায়। ছোটবেলা থেকেই তারা ভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তারা বড় হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগ গড়ে ওঠেনি কখনই। আমেরিকান ছেলে-মেয়েরা একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর বাবা-মায়ের থেকে আলাদা থাকতেই পছন্দ করে। এমন নয় যে, গোগোল ও সোনিয়া তাদের বাবা-মাকে ভালবাসে না, কিন্তু তারা আমেরিকান ছেলে-মেয়েদের মতো আলাদা থাকাটাকেই শ্রেয় বলে মনে করে। সুতরাং গোগোল ও সোনিয়ার পক্ষে যা যা স্বাভাবিক, একান্তভাবে বাঙালি-প্রাণ অসীমার কাছে সেগুলিই অস্বাভাবিক ঠেকে। অসীমা চান আর না-ই চান এই নিয়তিকে মেনে নেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই। অসীমা তখন সান্ত্বনা পেতে চান শুধু এই ভেবে যে, তিনি দুটো ভবঘুরে ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়েছেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে, 'স্বাধীনতা' ও 'স্বেচ্ছাচার'— শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে এই পার্থক্যের বোধ বাঙালি বা ভারতীয় সমাজ ও পরিবার জীবনে যতটা স্পষ্ট, বিদেশে ততটা নয়। আমেরিকান বাবা মায়েরা নিজেদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের এক বা একাধিক প্রাক্-বিবাহ যৌন সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ ভাবিত নয়। যৌনতা নিয়ে তাদের রাখঢাক একেবারেই নেই। কিন্তু বাঙালি বা ভারতীয় সমাজে প্রাক্-বিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক যৌন ব্যভিচার বলেই গণ্য হয়ে থাকে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, একালের বাঙালি সমাজেও নরনারীর যৌন সম্পর্কের মধ্যে কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। শহরাঞ্চলের শিক্ষিত বাঙালি নরনারীদের অনেকেই এখন যৌনতাকে শুধু বিবাহের শাস্ত্রসম্মত শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে চাইছেন না। কিন্তু, একথা মানতেই হবে যে, শহর কলকাতার নিউ ইয়র্ক হয়ে উঠতে এখনও ঢের দেরি। *সমনামী* উপন্যাসে দুই সন্তানের জননী অসীমার বিড়ম্বনা তাঁর ছেলে-মেয়ের স্বাধীনতা নিয়ে নয়, তাদের স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে। বৎসরাধিককাল ধরে গোগোল তার পছন্দের পাত্রী ম্যাক্সিনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে, নিয়মিত তার সঙ্গে উদ্দাম শারীরিক মিলনে লিপ্ত হচ্ছে। অসীমা ম্যাক্সিনকে তাঁর পুত্রবধূ হিসেবে মোটেই মেনে নিতে চান না। কিন্তু, সংস্কৃতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই সম্পর্ক মেনে নেওয়া ছাড়া অসীমা আর কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না। অসীমা স্পষ্টত অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, বাঁধভাঙা জলস্রোত আটকাবার প্রয়াস বৃথা। কিন্তু ট্র্যাজেডি এখানেই যে, অসীমা যখন ম্যাক্সিনকে মনে মনে মেনেই নিয়েছেন— তখনই গোগোল-ম্যাক্সিনের সম্পর্ক চিরকালের জন্য ভেঙে গেছে। বাবা মারা যাবার পর গোগোলের মানসিকতায় পরিবর্তন দেখা দেয়। এতদিন সপ্তাহান্তে বা মাঝে মাঝে অফিস থেকে ছুটি পেলেও গোগোল বাবা-মা-বোনের সঙ্গে দেখা না করে ম্যাক্সিনের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে ছুটি কাটিয়েছে। এখন সে তার বোন সোনিয়া ও বিধবা মায়ের কথা ভেবে তাদের সঙ্গে সপ্তাহান্তে দেখা করতে যায়। রোজ সন্ধেয় মা ও বোনের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে। পারিবারিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কেও অনেকটা সচেতন হয়ে ওঠে। ম্যাক্সিনের সঙ্গে তার উদ্দাম যৌনতায়ও কিছুটা ভাঁটা পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ম্যাক্সিন নিজেকে, নিজের মনকে স্থির রাখতে পারেনি —

প্রথম প্রথম ম্যাক্সিন ধৈর্য ধরেছিল। গোগোলকে ধাতস্থ হতে সময় দিয়েছিল। অফিসের পর জেরাল্ড আর লিডিয়ার বাড়িতে ফিরে যেত গোগোল, সেই দুনিয়ায় যেখানে কিছুই বদলায়নি, সবই আগের মতো। ডিনার টেবিলে গোগোলের নীরবতা কিছুদিন মেনে নিয়েছিল ম্যাক্সিন। মেনে নিয়েছিল যৌনমিলনে তার অনাগ্রহ, রোজ সন্ধেয় মা আর সোনিয়ার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন, উইকএন্ডে প্রেয়সীকে একা রেখে পেস্বারটন রোডে ফিরে যাওয়া। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চায়নি একটা কথা। সে গোগোলের প্রেমিকা হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে না নিয়ে গোগোলেরা সেই গ্রীষ্মে সকলের সঙ্গে দেখা করতে আর অশোকের অস্থিভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপ করতে কলকাতায় যাবে। সেই থেকে তর্কাতর্কি শুরু। একদিন ম্যাক্সিন বলেই ফেলল, মা আর সোনিয়াকে তার হিংসে হয়। গোগোলের এ কথাটা এতই অবাস্তব ঠেকেছিল যে, সে কোনও উত্তর দেয়নি। [১৯]

সুতরাং, বাবার মৃত্যুর কয়েকমাস পরে গোগোল ম্যাক্সিনের জীবন থেকে বেরিয়ে এল। প্রকৃতপক্ষে গোগোল-ম্যাক্সিনের প্রেমে গভীরতা কম। এই প্রেম একান্তই শরীরসর্বস্ব। কাজেই বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক তৈরি হবার

পূর্বেই যখন শরীরের দাবি মিটে গেছে, যৌনতায় বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দিয়েছে, তখন সহজেই সে প্রেম ভেঙে গেছে। তাছাড়া, ম্যাক্সিনের মন আদৌ বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারের বধূ হবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। সবচেয়ে বড় কথা প্রেমিক ও প্রেমিকা যেখানে ভিন্ন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে, সেখানে একে অন্যের সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থাকাটা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমিকা ম্যাক্সিনকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাওয়া, সেখানে খোলামেলা জীবনযাপন করা যে সম্ভব নয়—তা বোঝার ক্ষমতা ম্যাক্সিনের ছিল না। ম্যাক্সিন চেয়েছিল গোগোল শুধু ওকে নিয়েই মেতে থাকুক, যা পিতৃ-বিয়োগের পর গোগোলের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, পিতৃবিয়োগের পর বাবার আদর্শকে সম্মান করতে শুরু করেছে গোগোল। যে একসময় নিজেকে আত্মিকভাবে মার্কিন সত্তার অধিকারী বলে মনে করত সে এবার স্বেচ্ছায় মস্তকমুণ্ডন পর্যন্ত করেছে। বাবার অস্থিভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দিতেও তার আপত্তি নেই। বোঝা যায়, গোগোল এবার নিজের শিকড় চিনতে শুরু করেছে।

ম্যাক্সিনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর গোগোল জনৈকা বিবাহিতা রমনী ব্রিজেটের সংস্পর্শে আসে। ব্রিজেট নিউ অরলিয়ান্সের মেয়ে, বেশ আকর্ষক চেহারা, একটা ছোট ফার্মে চাকুরি করে। গোগোল তার সঙ্গে নিজেদের প্রোজেক্ট নিয়ে আলোচনা করে, একসঙ্গে বারে খেতে যায়। এভাবেই তারা ক্রমশ একে অন্যের কাছাকাছি আসে। ব্রিজেটের স্বামী বস্টনের কলেজের প্রোফেসর, শুধু শনি ও রবিবার দুজনের দেখা হয়। গোগোলের মনে হয় এভাবে একা থাকা নিশ্চয়ই কঠিন, কেননা— সে নিজেই দেখেছে তার বাবার জীবনের শেষকটা মাস দু'জনে দু'শহরে কাটিয়েছে। গোগোল ব্রিজেটের কাছেই শুনতে পেয়েছে যে, তার স্বামী ব্রুকলিনের বাড়িতে নেমপ্লেটে ব্রিজেটের নাম লিখে রেখেছে, অ্যানসারিং মেশিনে ব্রিজেটের গলা, আলমারিতে ব্রিজেটের পোশাক, এমনকি ব্রিজেটের একটা লিপস্টিকও সেখানে রয়েছে। ব্রিজেটের স্বামী এই চিহ্ন ও বস্তুগুলি আগলে রেখে সারা সপ্তাহ ব্রিজেটের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। স্বামীর ভালবাসা যে স্ত্রীর প্রতি এত প্রবল, সেই স্ত্রী কিন্তু দূরত্বের যন্ত্রণা নিয়ে এতটা ভাবিত নয়। তার মতে, এভাবে আলাদা থাকা কঠিন হতে পারে, কিন্তু মেনে নিতে হয়। গোগোলের মনে এক ধরণের অপরাধবোধ তীব্র হয়ে ওঠে, যখন সে দেখতে পায় স্বামীর প্রবল ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও ব্রিজেট নিজের শরীর একাধিক পরপুরুষের কাছে বিলিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততবোধ করে না। গোগোল স্পষ্ট বুঝতে পারে প্রেমে শরীরের দাবিই এখানে মুখ্য। বাবার অকাল মৃত্যুর পর গোগোল এমনিতেই মানসিকভাবে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিল,তার পর ব্রিজেটের সঙ্গে পরিচয়ের পর গোগোলের মানসিকতায় আরও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। গোগোল ব্রিজেটকে এড়িয়ে গিয়ে ক্রমশ শান্ত ও নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। গোগোলের জীবনে একের পর এক সম্পর্ক ভেঙে গেলে অসীমা আর এক প্রবাসী বাঙালি ঘরের কন্যা মৌসুমীর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। গোগোল-মৌসুমী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু এই বিবাহও স্থায়ী হল না। মৌসুমী এতটাই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী যে, প্রাক্-বিবাহ যৌন সম্পর্ক বা বিবাহ অতিরিক্ত যৌন সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র রাখঢাক নেই। গোগোলকে বিয়ে করেও সে একদিন অনায়াসে তার পছন্দের পুরুষের কাছে ধরা দিয়েছে। লক্ষণীয়, গোগোলের জীবনে যে-সব নারী এসেছে তারা সকলেই স্বাবলম্বী, প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী। সম্পর্ক যেখানে নির্ভরশীলতার নয় সেখানে সামান্য কারণেই তা ভেঙে যেতে পারে। হয়তো আজ আর একথা নতুন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন নেই যে, — ''ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যেই নিহিত ছিল মানুষের উত্তরকালীন নিঃসঙ্গতার বীজ।" [২০] উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে প্রেম করবার পর অশোক- অসীমার কন্যা সোনিয়াও তার মার্কিন বন্ধুকে বিয়ে করবার জন্য প্রস্তুত। তারা আলাদা থাকবে, নতুন সংসার করবে। তাদের এই সংসারে নিঃসঙ্গ অসীমার ঠাঁই নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সন্তান-সন্ততিদের মানুষ করে তোলা, তাদের নিয়ে নানা উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি বিষয়ে বাণী বসুর '*জন্মভূমি মাতৃভূমি*' উপন্যাসের সঙ্গে ঝুম্পা লাহিড়ীর '*সমনামী*' উপন্যাসের বিশেষ মিল রয়েছে। তবে, *জন্মভূমি মাতৃভূমি* -র সুদীপ-কমলিকার ভাবনার সঙ্গে *সমনামী* র অশোক-অসীমার ভাবনার মধ্যে অন্তত একটি বিষয়ে এখানে পার্থক্য রয়েছে। সুদীপ কমলিকার মতো অশোক-অসীমা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। সুদীপ-কমলিকা ছেলেমেয়েদের যেখানে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছেন, সেখানে অশোক-অসীমা তাঁদের ছেলেমেয়েদের গণ্ডির বাইরে বিচরণ করতে দিয়েছেন। লক্ষণীয়, *জন্মভূমি মাতৃভূমি*

(১৯৮৭) ও *সমনামী* (২০০৩) উপন্যাস দুটি রচনার মধ্যে কালগত ব্যবধান দেড় দশকেরও কিছু বেশি। বিগত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে প্রযুক্তি,বিজ্ঞানের হাত ধরে গোটা পৃথিবীতে এক বিরাট পরিবর্তনের ঢেউ লাগতে শুরু করেছে। মানুষের চিন্তাভাবনা, জীবনযাত্রার ধরণ সবেতেই আমূল পরিবর্তনের হাওয়া। সেলফোন, কম্প্যুটার, ইন্টারনেটের দৌলতে গোটা পৃথিবী আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। একেবারে ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েরা এই সব প্রযুক্তির সুফল কুফল দুইই গ্রহণ করতে শিখে যাচ্ছে। তাদের মানসিক বয়সও ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় ছোটরা আজ আর ছোট নেই, প্রয়োজনে তারা বড়দেরও অনেক কিছু শিখিয়ে দিতে পারে। একালের ছেলেমেয়েরা তাদের নিজস্ব জীবনভাবনা দিয়ে নিজেদের জীবন গড়ে নিতে চায়। তারা কেউ কারও মতো হতে চায় না, তারা হতে চায় যে যার নিজের মতো। অশোক-অসীমা এই বাস্তব সত্যটি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা তাঁদের সন্তানদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি। কিন্তু, বাণী বসুর *জন্মভূমি মাতৃভূমি* উপন্যাসে সুদীপ-কমলিকা তাঁদের ছেলেমেয়েদের পারিবারিক ঐতিহ্যের একটা শৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন।

জন্মভূমি মাতৃভূমি উপন্যাসের সঙ্গে *সমনামী* উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্সের বিশেষ মিল রয়েছে। *জন্মভূমি মাতৃভূমি* উপন্যাসে কমলিকা যেমন অকালে বিধবা হয়েছেন, তেমনি *সমনামী* উপন্যাসেও অসীমা অকালে বিধবা হয়েছেন। একজন স্বামীকে হারিয়েছেন স্বদেশে, অন্যজন বিদেশে; একজন প্রত্যাবর্তনের পরে, অন্যজন প্রত্যাবর্তনের পূর্বে। আমেরিকায় সুদীপ-কমলিকার জীবনে তেমন কোনও বিশেষ সমস্যা ছিল না। কিন্তু শিকড় যাদের প্রোথিত জন্মভূমির মাটিতে, প্রবাস জীবন তো তাদের কাছে একপ্রকার বনবাস ছাড়া আর কিছু নয়। কমলিকার স্বামী সুদীপ আমেরিকার দ্রুতগতির জীবনের সঙ্গে সবসময় তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন। একদিন মধ্যরাতে দাম্পত্য শয্যায় শায়িত, নির্ঘুম সুদীপ তাঁর হতাশা প্রকাশ করে স্ত্রী কমলিকাকে বলেন —

> *আমি আজকাল ব্লান্ট হয়ে যাচ্ছি, তার মানে ফুরিয়ে যাচ্ছি কমলিকা . . . এজ ইজ রিয়্যালিটি। আর কে যে কখন ফুরিয়ে যাবে আগে থেকে বলা যায় না। তবে সারাজীবনই খুব হেকটিক লাইফ কাটিয়েছি। এই র‍্যাট রেস আমার আর ভাল লাগছে না। অনেকদিন যৌবন ভোগ করেছি, আমি এবার প্রৌঢ়ই হতে চাই। গত পনেরো বছরে ক'টা পেপার পাবলিশ করেছি হিসেব আছে? পনেরো দুগুনে তিরিশটা প্লাস পাঁচটা। এর মধ্যে গোটা বারো করেছি আমার নিজের আনন্দে, নিজের তাগিদে। বাকি সব ওই র‍্যাট রেস আমার ঘাড় ধরে করিয়ে নিয়েছে। এভাবে শুধু কাজের জন্য কাজ আমি আর পারব না। এ অবস্থাটার চেঞ্জ হওয়া আমার পক্ষে ভয়ানক জরুরি।* [২১]

সুদীপ দেশে ফিরতে চান সপরিবারে। কমলিকাকে তিনি বোঝান—

> *তুমি আমার কথা ভেবো না, ছেলের কথা না, মেয়ের কথাও না। মনে করো আর তিন-চার বছরের মধ্যে মেয়ে কলেজ হস্টেলে, বলা যায় না হয়তো কোনো ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করছে, বাবু চাকরি করছে অন্য কোনো স্টেটে, কিংবা দেশে ফিরে গেছে। তুমি এইরকম একটা কৌটোর মতো অ্যাপার্টমেন্টে একা। আমি ...আমি হয়তো নেই আর ... ।* [২২]

জন্মভূমি মাতৃভূমি উপন্যাসে সুদীপ-কমলিকা শেষপর্যন্ত দেশে ফিরে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের এই ফেরা একেবারেই সুখকর হয় নি। দীর্ঘকাল আমেরিকায় বসবাস করার ফলে সুদীপ কিছু গুণাবলী অর্জন করেন। ন্যায়-নীতির আদর্শ, পরিচ্ছন্নতা, কর্মদক্ষতা, কর্মসংস্কৃতি, সঙ্কীর্ণ রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে নিঃশব্দে ও নিঃস্বার্থে শুধু কাজ করে যাওয়ার মানসিকতা, কর্মক্ষেত্রে চূড়ান্ত পেশাদারিত্ব— ইত্যাদি নানা acquired qualities এর দ্বারা সুদীপের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। আমেরিকা তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছে,যে স্বাতন্ত্র্যবোধ সঙ্গে নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন সেগুলির প্রয়োগ তিনি ঘটাতে পারলেন না শহর কলকাতার নাগরিক জীবনে। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি দেখতে পান তাঁদের একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল টেনশন্। কলকাতায় ফিরে এসে সুদীপ যে কলেজটিতে অধ্যক্ষের চাকুরিতে যোগ দিয়েছিলেন, সেখানেও তাঁকে বারবার ছাত্র-শিক্ষক এক অশুভ আঁতাতের চক্রান্তের কাছে অপদস্ত হতে হয়েছে। একদিন কলেজে তাঁকে চূড়ান্তভাবে অপদস্ত হতে হয়। দীর্ঘক্ষণ তাঁকে ঘেরাও করে রাখা হয়। তাঁকে টয়লেটে পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়নি। সহকর্মীদের কাছ থেকেও তিনি বিশেষ কোনও সহযোগিতা পান নি। মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত সুদীপ সেদিন বাড়ি ফিরে এসে ঘরের সামনে সিঁড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন। বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে যতই স্বার্থবুদ্ধি, সঙ্কীর্ণতা

থাকুক না কেন, ক্ষেত্রবিশেষে এটাও লক্ষ করা যায় যে শহুরে উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের শিক্ষার গৌরব অর্থকৌলীন্যকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। কিন্তু, ট্রাজেডি এখানেই যে, এই শিক্ষার গৌরবই পরিণামে মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তোলে। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর *বনপলাশির পদাবলী* (১৯৬২) উপন্যাসে গিরিজাপ্রসাদ দীর্ঘকাল কর্মসূত্রে জন্মভূমির বাইরে ছিলেন। চাকুরী জীবন থেকে অবসর নেবার পর তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন প্রচুর অর্থ সঙ্গে নিয়ে নয়, সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন শিক্ষার গৌরব। কিন্তু তিনি গ্রামীন সমাজের সঙ্কীর্ণ মানসিকতার সঙ্গে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেননি। *জন্মভূমি মাতৃভূমি* -র মতোই ঝুম্পা লাহিড়ীর *সমনামী* উপন্যাসেও অসীমার স্বামী অশোকেরও মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে। অবশ্য তাঁকে সেখানে কোনও হীন চক্রান্তের শিকার হতে হয়নি। নৈরাজ্য,নীতিহীনতা আমেরিকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে একেবারেই নেই। কিন্তু,অশোক যে পুরোপুরি চাপমুক্ত ছিলেন এমন কথা বলা যাবে না। নিজের পরিবার নিয়ে একটা চাপা টেনশন্ তো তাঁর মধ্যে ছিলই। নইলে পেটের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর কেন তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবেন? আসলে, intellectual মানুষের জীবনে এক ধরণের নিঃসঙ্গতা থাকেই। ব্যক্তিচৈতন্য তাঁদের যেমন আশ্রয়, তেমনি তা যন্ত্রণারও কারণ। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতেই বুদ্ধিজীবী মানুষদের মধ্যে এক ধরণের নিঃসঙ্গতা লক্ষ করা গেছে—যার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বাংলা উপন্যাসে। রমাপদ চৌধুরীর *বীজ* (১৯৭৭) উপন্যাসেও দেখা গেছে যে, ইতিহাসের একজন প্রতিশ্রুতিবান অধ্যাপক গবেষণাকর্মে ডুবে থাকতে থাকতে ক্রমশ কর্মস্থলে, এমনকি নিজের পরিবারেও নিঃসঙ্গে হয়ে গেছেন। অশোক নিজের কেরিয়ার গোছাতে গিয়ে নিজের পরিবারটিকে ঠিকমতো গোছাতে পারলেন না। সুদীপও দীর্ঘকাল আমেরিকায় থেকে যে শিক্ষা, স্বাতন্ত্র্যবোধ অর্জন করেছেন, পরিণামে সেই শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যবোধই তাঁর জীবনের পরিণতিকে করুণ করে তুলেছে।

বস্তুত, *জন্মভূমি মাতৃভূমি* উপন্যাসে সুদীপ যে ক্লান্তি ও হতাশার কথা বলেছেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তা-ই কিন্তু পুরোপুরি সত্য হয়ে উঠেছে ঝুম্পা লাহিড়ীর *সমনামী* উপন্যাসে। ক্লান্তি ও হতাশা *সমনামী*-র অশোককেও গ্রাস করেছিল বলেই তিনি পেম্বারটন রোডের বাড়িতে অসীমাকে একা রেখে ছ'মাসের জন্য অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে চলে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে নিঃসঙ্গ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। অশোক কি নিজের মৃত্যুর পূর্বাভাস পেয়েছিলেন? অসীমার তো মনে হয়েছেই যে, অশোক তাঁকে নিঃসঙ্গ ও একাকি জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তুলতেই তাঁকে একা রেখে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়েছিলেন। বাণী বসুর উপন্যাসটিতে সুদীপ তাঁর ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, তাও সত্য হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে ঝুম্পা লাহিড়ীর *সমনামী*- র অশোক-অসীমার পুত্র-কন্যার জীবনে। পুত্র গোগোল নিউ ইয়র্কে একা থাকতে শুরু করেছে। কন্যা সোনিয়াও বাবা-মায়ের থেকে আলাদা থাকে। সে তার আমেরিকান বন্ধু বেন-কে বিয়ে করে আমেরিকাতেই আলাদাভাবে নতুন জীবন গড়ে তুলবে বলবে মনস্থ করে ফেলেছে। তাই অনেকটা অপরিহার্য কারণেই *জন্মভূমি মাতৃভূমি* ও *সমনামী* দুটি উপন্যাসেরই শেষে তুলে ধরা হয়েছে বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা। তবে এই প্রত্যাবর্তনের তাগিদ *জন্মভূমি মাতৃভূমি* তে পুরুষের (সুদীপ) দিক থেকে,অন্যদিকে *সমনামী* তে নারীর (অসীমা) দিক থেকে । উভয় উপন্যাসেই এই প্রত্যাবর্তন সুখকর নয়, বরং প্রবল হতাশাব্যঞ্জক। *জন্মভূমি মাতৃভূমি* তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর বাবু চিরস্থায়ীভাবে দেশেই থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। বাবুর জন্ম কলকাতায়, তাঁর সত্তার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে এখানকার মাটিতে। কাজেই তার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু, আরাত্রিকার জন্ম ভারতে নয়, আমেরিকায়। সুতরাং তার পক্ষে পুনরায় আমেরিকা ফিরে যাওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। বাবা মারা যাবার পর সে *অ্যামেরিকান ন্যাশনালস্ লিভিং অ্যাব্রড* খাতে স্কলারসিপ নিয়ে জন্মভূমিতেই চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সে তার মা-কে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু, সদ্য স্বামীহারা কমলিকা ততদিনে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তাই পুনরায় নিজেকে তিনি আর উৎপাটিত করতে চান না। আরাত্রিকার ফিরে যাবার সিদ্ধান্তকেও তিনি মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারেন না। আরাত্রিকাকে তিনি অভিমানের সুরে বলেন—

আমার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব নয় মণি। তোদের নতুন যৌবন, উৎসাহ বেশি,শক্তি বেশি। তোদের প্রজন্মের সঙ্গে কি আমি তাল মেলাতে পারি? তার চেয়ে আমার নিজের সময়ের মানুষরা যাঁদের সঙ্গে আমি এক স্মৃতি ভাগ করে নিয়ে বাঁচতে পারি তাদের কাছে থাকাই আমার ভাল . . .তোর যদি একান্তই যেতে হয়, যাবি। আমার কথা ভাবিস না। [২৩]

বাবু মা-কে বোঝাতে চায়, সান্ত্বনা দেয়— '' মা, তুমি মণির ওপর অভিমান করছ কেন? ওর তো এখানকার ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার ইচ্ছেটা না থাকাই স্বাভাবিক। ওর দিকটাও দেখো। পড়াশোনা শেষ করে আসুক না। চার-পাঁচ বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। প্রতি বছর হয় আমরা যাব, নয় ও আসবে একবার।" [২৪] কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে বাবুর এই ভাবনার মধ্যে দ্বিচারিতা রয়েছে। জন্মভূমির প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত সে যদি চিরস্থায়ীভাবে দেশে থেকে যেতে পারে, তাহলে আরাত্রিকাই বা কেন তার জন্মভূমি আমেরিকায় পাকাপাকিভাবে ফিরে যাবে না? লক্ষণীয়, এ বিষয়ে আরাত্রিকার স্বগত কথন — '' হ্যাঁ আসব ঠিকই। এই পরবাসে আমার মা পড়ে রইল, দাদা পড়ে রইল, এখানকার মাটিতে আমার বাবাকে রেখে যাচ্ছি। বারে বারে আসতেই হবে। কিন্তু, সে শুধু আসাই, ফেরা নয়। জন্মভূমি আর মাতৃভূমির এই দড়ি-টানাটানিতে শেষ পর্যন্ত জিতুক আমার জন্মভূমির মাটি।" [২৫] আসলে মানুষের পক্ষে সবরকম বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া কার্যত অসম্ভব। আছে অভ্যাসের বন্ধন, স্বভাবের বন্ধন, রক্তের বন্ধন, ভালবাসার বন্ধন। কিন্তু যে মেয়ে জীবনের প্রায় চোদ্দোটা বছর তার জন্মভূমির দুরন্ত স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে বড় হয়েছে এবং তারপর বুকভরা প্রত্যাশা নিয়ে বাবা-মায়ের হাত ধরে জন্মভূমি থেকে উৎপাটিত হয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে এসে প্রতি পদে পদে তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা খণ্ডিত হবার ভয়ানক সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাকে তো মুক্তির মশাল হাতে নিয়ে জন্মভূমিতে ফিরে যেতেই হবে। আরাত্রিকা কলকাতার পথে চলতে গিয়ে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়েছে, অশ্রাব্য কথা শুনতে হয়েছে। শিক্ষা-ব্যবস্থার চূড়ান্ত গাফিলতির শিকার হতে হয়েছে। ইংরেজিতে তুখোর হওয়া সত্ত্বেও এবং ভাল পরীক্ষা দিয়েও তার প্রাপ্ত নম্বর ১০০তে ৩৭। অন্যদিকে, তারই সহপাঠী সব প্রশ্নের উত্তর করতে না পেরেও ৭৩ পেয়ে গেছে। যে দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার এই হাল– সেখানে ভাগ্যের দোহাই দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কাজেই আরাত্রিকার মতো একটি মেয়ের আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাস্তবোচিত বলেই মনে হয়। বাণী বসুর *জন্মভূমি মাতৃভূমি* উপন্যাসে স্বদেশ ও বিদেশ নিয়ে যে দড়ি-টানাটানি, ঝুম্পা লাহিড়ীর *সমনামী* উপন্যাসেও প্রায় একই ধরণের পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। *জন্মভূমি মাতৃভূমি* তে স্বদেশ জন্মসূত্রে ভারতীয় বলেই পাকাপাকিভাবে কলকাতায় থেকে যায়, আরাত্রিকার জন্ম আমেরিকায়—সে তার জন্মভূমিতেই ফিরে যাবার সংকল্প করে। *সমনামী* তে অসীমার পুত্র ও কন্যা— গোগোল ও সোনিয়া আত্মিকভাবে আমেরিকান। তারা দুজনেই আমেরিকাতে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সমস্যা শুধু *জন্মভূমি মাতৃভূমি*- র কমলিকার আর *সমনামী*- র অসীমার। কমলিকা দেশে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেও, আরাত্রিকার জন্যে যে তাঁর মন বারবার আমেরিকায় উড়ে চলে যাবে না—তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সন্তানের জন্য মায়ের যে স্বাভাবিক অপত্ন স্নেহ থাকে— সেই স্নেহ, ভালবাসা থেকে কন্যা আরাত্রিকাকে চিরকাল বঞ্চিত করে রাখবেন কেমন করে? *সমনামী* তে এই জন্যেই অসীমাকে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। অসীমার দাম্পত্য জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতি যেমন আমেরিকার শহরে, তেমনি তাঁর পুত্র-কন্যারাও আত্মিকভাবে আমেরিকান। শিকড়ের টানে তিনি কলকাতায় ফিরলেও আমেরিকা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকবেই। কাজেই অসীমা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এবার থেকে তিনি ছ'মাস কলকাতায় ও ছ'মাস আমেরিকায়— এভাবেই সারাটা জীবন একপ্রকার ত্রিশঙ্কু হয়েই থেকে যাবেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, *সমনামী* উপন্যাসের বিষয়বস্তুর পূর্বসূত্র অনেকটাই নিহিত রয়েছে *জন্মভূমি মাতৃভূমি* উপন্যাসের বিষয়াভ্যন্তরে। *জন্মভূমি মাতৃভূমি* ও *সমনামী*-কে পাশাপাশি রেখে উপন্যাস দুটির পরিপূরক পাঠ গ্রহণ করা যেতেই পারে।

তথ্যসূত্র :

১। লাহিড়ী ঝুম্পা, 'সমনামী', চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা—৯, পৃষ্ঠা—১৪।
২। তদেব,পৃষ্ঠা—৩২।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা—৪০।

৪। বসু বাণী, 'জন্মভূমি মাতৃভূমি', 'দশটি উপন্যাস'। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি, কল-৯। পৃষ্ঠা—১৬।
৫। তদেব, পৃষ্ঠা—২৩।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা—২৬।
৭। তদেব, পৃষ্ঠা—৩০-৩১।
৮। তদেব, পৃষ্ঠা—৩১।
৯। তদেব, পৃষ্ঠা—২৭।
১০। তদেব, পৃষ্ঠা—৩৫।
১১। তদেব, পৃষ্ঠা—১৫।
১২। তদেব, পৃষ্ঠা—২৮।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা—২৮।
১৪। লাহিড়ী ঝুম্পা, 'সমনামী', চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা—৯, পৃষ্ঠা—১৭৫।
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা—১১৩।
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা—১৪৭।
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা—১৪৭।
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা—১৪৭-১৪৮।
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা—১৯৪।
২০। সিকদার অশ্রুকুমার, 'যুগলের নিঃসঙ্গতা', আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ,মার্চ ২০০৩। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা—৬। পৃষ্ঠা—১৮।
২১। বসু বাণী, 'জন্মভূমি মাতৃভূমি', 'দশটি উপন্যাস'। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০০৫। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি, কল-৯। পৃষ্ঠা—৪১-৪২।
২২। তদেব, পৃষ্ঠা—৪২।
২৩। তদেব, পৃষ্ঠা—৮৫।
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা—৮৫।
২৫। তদেব, পৃষ্ঠা—৮৫।